Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীদের মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাফিসা আয়মান

রোলঃ ২১৬০২০০৭৮

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীদের মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাফিসা আয়মান

রোলঃ ২১৬০২০০৭৮

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারীর মর্যাদা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাফিয়া আয়মান, আইডিঃ ২১৬০২০০৭৮ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামে নারীর মর্যাদা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

নাফিসা আয়মান

নাফিসা আয়মান

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

নাফিসা আয়মান

আইডিঃ ২১৬০২০০৭৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্র

ভূমিকাঃ 5

নারীঃ...6

ইসলাম পূর্ব বা জাহেলী যুগে নারীর অবস্থানঃ...6

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীঃ 7

ইসলামে নারীর মর্যাদাঃ...9

নারীদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুভূতিঃ..............................13

ইলমের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকারঃ..14

জীবিকার দায় থেকে অব্যাহতিঃ...17

সম্পদ সঞ্চয়ের অধিকারঃ 18

পাশ্চাত্যে নারীসমাজের দুর্দশাঃ...19

পাশ্চাত্যে নারী-স্বাধীনতার বিষফলঃ..22

পারিবারিক ব্যবস্থায় ধ্বসঃ..24

ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থাঃ..25

উপসংহারঃ 27

ভূমিকাঃ

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তার খলিফা হিসেবে প্রেরণ করার জন্য এবং তাকে হেদায়েতের পথে চলার জন্য দিয়েছেন আল কোরআন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যার মাধ্যেমে আল্লাহ দুনিয়াতে কোরআন পৌছে দিয়েছেন এবং দ্বীনে ইসলামকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম মানুষ হিসেবে আদম আলাহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তার পরেই তিনি তার অর্ধাঙ্গীনী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন মা হাওয়া আলাইহিস সালামকে। এভাবেই তাদের থেকে নারী এবং পুরুষ আসার পরিক্রমা তৈরি হয়। আল্লাহ সুবহানানহু ওয়া তা'য়ালা একজন পুরুষকে যেমন মর্যাদা দিয়েছেন একজন নারীকেও মর্যাদা দিয়েছেন। বরং পুরুষ থেকে নারীর মর্যাদা বেশি দিয়েছেন। আমার এই প্রবন্ধে আমি "ইসলামে নারীর মর্যাদা" সম্পর্কে লিখার সংক্ষিপ্ত প্রয়াস করছি। আল্লাহ আমাকে তাওফিক দান করুন।

নারীঃ

ইসলামে নারী হচ্ছে শ্রেষ্ট সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। বরং নারীকে ইসলামে পুরুষের থেকেও বেশি মর্যাদাবান করেছে। নারীর সঙ্গে পুরুষের যতগুলো সম্পর্ক হতে পারে প্রতিটি সম্পর্ককে ইসলাম অনন্য মর্যাদা ও মহিমায় অধিষ্ঠিত করেছে। এক্ষেত্রে নারীকে শুধু সমমর্যাদা নয়, বরং অগ্রমর্যাদা দান করেছে। যা মা হিসেবে হোক, স্ত্রী হিসেবে হোক বা মেয়ে হিসেবে হোক না কেন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইসলাম তাদের আলদা আলদা মর্যাদায় ভূষিত করেছে। নারীকে গোপন সম্পদ হিসেবে তুলনা করা হয়েছে। যে কোনো সম্পদ গোপন করে রাখা বা লোক চক্ষুর আড়াল করে রাখা মানে তার আলাদা একটা মূল্য আছে তাকে সেভাবে পরিচর্যা করা হয় ঠিক তেমনি নারীকে খুবই যত্নের সাথে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাকে সযত্নে লালন পালনের মাধ্যমে রয়েছে জান্নাত লাভের সুসংবাদ।

ইসলাম পূর্ব বা জাহেলী যুগে নারীর অবস্থানঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কোরআনুল কারীমে এরশাদ করেনঃ

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ □ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

অর্থঃ যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে; কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। সূরা তাকভীর, আয়াত : ৮-৯

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ □ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

অর্থঃ তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের 'সুসংবাদ' দেয়া হয় তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। সে এ সুসংবাদকে খারাপ মনে করে নিজ সম্প্রদায় থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (এবং চিন্তা করে) হীনতা স্বীকার করে তাকে নিজের কাছে রেখে দেবে,নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। কত নিকৃষ্ট ছিল তাদের সিদ্ধান্ত। সূরা নাহ্ল, আয়াত : ৫৮-৫৯।

উপরোক্ত দুটি আয়াত হল নারীর বিষয়ে জাহেলী যুগের প্রতিচ্ছবি। জাহেলী যুগে কন্যা সংবাদ জন্ম নেয়াকে দুঃসংবাদ হিসেবে ধরা হত। সে সমাজে পুরুষ ও জীবজন্তুর মধ্যস্থলে ছিল নারীর অবস্থান। কন্যা সন্তানের জন্ম সেখানে ছিল অভিশাপ আর অপমানের বিষয়। যেন তা মহাপাপ বা স্থায়ী অমর্যাদার কারণ। অপমানবোধ আর

মর্যাদা রক্ষায় জীবন্ত কবর দেয়া হতো কন্যা সন্তানকে। কত হীন মানসিকতা ও কতটা অপমানবোধ হলে মানুষ নিজের ঔরসজাত সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলতে পারে! সেখানে তো নারীকে মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না। প্রথম আয়াতে 'মাওউদাতু' সে মেয়েকে বলা হয়, যাকে জীবিত দাফন করা হয় যেন মাটির নীচে মারা যায়। কোনো কন্যা যদিও জ্যান্ত দাফন থেকে নিষ্কৃতি পেত, কিন্তু লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তি পেত না। নারীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সম্পদ যদিও প্রচুর হত, কিন্তু তার মৃত্যুর পর নারী কখনো মিরাসের অধিকারী হত না, যদিও সে হত অভাবী ও খুব সংকটাপন্ন! কারণ তাদের নিকট পুরুষদের জন্য মিরাস খাস ছিল, নারীদের তাতে কোনো অংশ ছিল না, বরং নারীরা মৃত স্বামীর সম্পদের ন্যায় মিরাসে পরিণত হত। ফলশ্রুতিতে এক পুরুষের অধীন অনেক নারী আবদ্ধ হত, যার নির্ধারিত কোনো সংখ্যা ছিল না। একাধিক সপত্নী বা সতীন থাকার কারণে নারীরা যে সংকীর্ণতা, যুলম ও কোণঠাসা অবস্থার সম্মুখীন হত -সেটাও তাদের অনেকের নিকট বিবেচ্য ছিল না। না নিজের সত্তার ওপর ছিল তার কোনো অধিকার, না সম্পদের উপর; বরং সে নিজেই ছিল সম্পদ; ওয়ারিসসূত্রে যার হাত বদল হত।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীঃ

গ্রীক ও রোমান সমাজে নারীকে মনে করা হতো সকল অনিষ্টের মূল এবং সবচে' নিকৃষ্ট প্রাণী। পরিবারে মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যা কোন নারীর মর্যাদাই দাসীর চেয়ে বেশী ছিলো না। নারী ছিলো বাজারে বেচা-কেনার পণ্য। পরিবার-প্রধান যে কোন নারীকে বাজারে বিক্রি করতে পারতো। কারণ আইনগতভাবেই নারী ছিলো পরিবারের অস্থাবর সম্পত্তি। কোন পর্যায়েই নারীর উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিলো না। পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী তার সম্পত্তি ভোগ করতে পারতো না এবং হস্তান্তরও করতে পারতো না। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর নিজস্ব কোন ইচ্ছা বা অধিকার ছিলো না। পরিবারের প্রধান পুরুষ যে স্বামী নির্বাচন করতো তাকেই গ্রহণ করতে নারী বাধ্য ছিলো।

তুরস্কের সুপ্রসিদ্ধ নারী বুদ্ধিজীবী খালিদা এদিব খানম গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় নারীর লাঞ্ছনা সম্পর্কে 'তুরস্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব' নামক গ্রন্থে অত্যন্ত বিশদ আলোচনা করেছেন।

ইহুদিজাতি ও খৃস্টধর্মে নারীকে অভিশপ্ত মনে করা হয়, কারণ তাদের ধারণায় আদমকে ভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান হাওয়াকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলো। উভয়জাতির বিশ্বাস ছিলো যে, স্ত্রীলোক স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না, কারণ তার মধ্যে মানবাত্মা নেই। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ৫৮৬ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সে এক ধর্মসম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো যে, স্ত্রীলোককে মানুষ বলা তো যায়, তবে তাকে শুধু পুরুষের সেবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

খৃস্টধর্মের প্রভাবে নারীর প্রতি পাশ্চাত্যজগতের আচরণ ছিলো চরম অবমাননামূলক, যা মধ্যযুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এমনকি ১৮০৫ সাল পর্যন্ত বৃটিশ আইনে স্বামীর অধিকার ছিলো স্ত্রীকে বিক্রি করার। অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লবের পরও নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করার কথা সেখানকার চিন্তানায়কদের মাথায় আসেনি। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ফরাসী নাগরিক আইনে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নারীর অধিকার ছিলো না কোন বিষয়ে কোন পক্ষের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার।

হিন্দুসমাজে নারীর অবস্থা ছিলো সবচে' করুণ। এ প্রসঙ্গে শুধু সতীদাহ-এর কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট, যা এই মাত্র সেদিন সংস্কারবাদী নেতা রাজা রামমোহন রায় ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমে বাতিল করিয়েছেন।

আরব জাহিলিয়াতের সমাজেও আছে নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার মর্মন্তুদ ইতিহাস। শুধু এইটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, কন্যাসন্তানের জন্মকে তখন মনে করা হতো চরম কলঙ্কের বিষয়। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وإذا بشر إحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا و هو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به, أيمسكه على هون أم يدسه في التراب, ألا ساء ما يحكمون

অর্থঃ আর যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তান জন্মের সংবাদ দেয়া হতো তখন দুশ্চিন্তায় তার মুখ কালো হয়ে যেতো, আর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। ঐ জঘন্য খবরের কারণে মানুষের কাছ থেকে সে মুখ লুকিয়ে ফিরতো। (আর দিশেহারা হয়ে ভাবতো যে কী করবে সে?) লাঞ্ছনা সহ্য করে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে। কত মন্দ ছিলো তাদের এ মনোভাব। সূরা নাহল : ৫৮

সেখানে নারীর জন্মগ্রহণই ছিলো অপরাধ, আর বেঁচে থাকা ছিলো আরো বড় অপরাধ। তাই অধিকাংশ সময় জন্মদাতা পিতা কন্যাসন্তানকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতো এবং নিজের হাতে জ্যান্ত দাফন করে ফেলতো। অসহায় মায়ের বাধা দেয়ার কোন অধিকার ছিলো না। তাই কন্যাসন্তান জন্ম দেয়ার আশঙ্কায় মা ভুলে যেতো তার

প্রসববেদনা। অস্থির পেরেশান হয়ে শুধু ভাবতো পিতার নিষ্ঠুরতা থেকে কীভাবে সে বাঁচাবে তার সন্তানকে? কোথায় কীভাবে লুকাবে সে তার কলিজার টুকরোকে? কোরআনে অত্যন্ত আবেদনপূর্ণ ভাষায় এই নিষ্ঠুর প্রথার নিন্দা করে বলা হয়েছে-

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

অর্থঃ আর যখন জ্যান্ত দাফনকৃত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো (তখন কী জবাব দেবে তোমরা?) সূরা আত-তাকভীর : ৮ ও ৯

তো এই ছিলো ইসলামের পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থা ও মর্যাদাগত অবস্থান। এককথায় যদি বলি তাহলে বলতে হয়, মানুষ হিসাবে নারীর কোন মর্যাদাই ছিলো না। চরম লাঞ্ছনা ও যিল্লতি ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই ছিলো না।

ইসলামে নারীর মর্যাদাঃ

ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা দিয়েছে তা আমরা কোরআন ও হাদিসের থেকে জানতে পারবো।

নারী ও পুরুষের মৌলিকভাবে সমান অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে কোরআনে বলা হয়েছে-

هن لباس لكم و أنتم لباس لهن

অর্থঃ এবং নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। তবে তাদের উপর পুরুষদের এক পর্যায়ের প্রাধান্য রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। সূরা বাকারা : ২২৮

এই এক পর্যায়ের প্রাধান্য হল, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধানের মর্যাদা, যা সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর এটি স্বামী-স্ত্রীর জীবন চলার পথে একটি অপরিহার্য বিষয়।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

إنما النساء شقائق الرجال

অর্থাৎ নারীরা হলো পুরুষের সমতুল্য। সুনানে আবু দাউদ ১/৩১

আরো ইরশাদ হয়েছে-

من كانت له أنثى فلم يئدها و لم يهنها و لم يؤثر ولده الذكور عليها أدخلها الله الجنة

অর্থঃ যে ব্যক্তি কন্যসন্তানকে জ্যান্ত দাফন করবে না এবং তার অমর্যাদা করবে না এবং পুত্রসন্তানকে তার উপর অগ্রাধিকার দেবে না আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখেল করবেন। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৫১০৩

দ্বীন ও ধর্মের যাবতীয় কর্মে নারী ও পুরুষের সমমর্যাদা সম্পর্কে কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

و من عمل صلحا من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فأؤلئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب

আর যে কোন পুরুষ বা নারী নেক আমল করবে, আর সে মুমিন হবে, তাহলে তারা জান্নাতে দাখেল হবে এবং সেখানে তাদেরকে বেলা হিসাব রিযিক দান করা হবে। সূরা মুমিন : ৪০

আরো ইরশাদ হয়েছে-

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عمل منكم من ذكر أو أنثى, بعضكم من بعض

অর্থঃ অনন্তর তাদের প্রতিপালক তাদের দু‘আ কবুল করলেন (আর বললেন) যে, আমি তোমাদের কোন আমলকারীর আমল নষ্ট করবো না, সে পুরুষ হোক, বা নারী। তোমরা তো পরস্পরের অংশবিশেষ। সূরা আলইমরান : ১৯৫

বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলাম নারীকে বিভিন্ন মর্যাদায় ভূষিত করে। নিচে তা নিয়ে আলোচনা করা হলঃ

মা হিসেবে-

তো ইসলাম ও তার নবীর কাছে মায়ের যে মর্যাদা তা পৃথিবীর কোন ধর্ম ও সভ্যতা এমনকি আধুনিক সভ্যতাও কল্পনা করতে পারেনি। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها

অর্থঃ আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারের আদেশ করেছি। (কারণ) তার মা তাকে কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সঙ্গে প্রসব করেছে। সূরা আহকাফ : ১৫

এখানে পিতা-মাতা উভয়ের সঙ্গে সদাচার কেন করতে হবে তার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে পিতার কোন অবদানের কথা বলা হয়নি, শুধু মায়ের ত্যাগ ও কষ্টের কথা বলা হয়েছে। অথচ পিতারও বিরাট অবদান রয়েছে সন্তানের জীবনে। এটা এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, মাতার ত্যাগ ও কষ্টের তুলনায় পিতার ত্যাগ ও কষ্ট খুবই সামান্য।

হাদীস শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সদাচারের বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী বললেন, এর পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী বললেন, এর পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী বললেন, এর পর কে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর পর তোমার বাবা। সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৯৭১

শুধু এই হাদীসই নয়, বরং অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, এক সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে গমন করতে চাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি মা আছেন? সাহাবী বললেন, আছেন। তখন তিনি বললেন, যাও তার কাছে বসে থাকো, কেননা জান্নাত তার পায়েরই কাছে। মুসনাদে আহমদ ৩/৪২৯; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ১৩/৮০

অন্য বর্ণনায় আছে,'জান্নাত হলো মায়েদের কদমের নীচে।' মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ৭৩৩০

স্ত্রী হিসেবে-

কোরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-

و عاشروهن بالمعروف, فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيأ و يجعل الله فيه خيرا كثيرا

অর্থঃ আর তোমরা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বসবাস করো সদাচারের সাথে। আর যদি (কোন কারণে) তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো তাহলে হতে পারে যে, তোমরা এমন কোন কিছুকে অপছন্দ করলে, আর আল্লাহ তাতে প্রচুর কল্যাণ রেখে দিলেন। (সূরা নিসা : ১৯)

এ বিষয়টি হাদীস শরীফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন, 'কোন মুমিন পুরুষ কোন মুমিন নারীকে যেন সম্পূর্ণ অপছন্দ না করে। কারণ তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে, আরেকটি স্বভাব অবশ্যই পছন্দনীয় হবে। সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৬৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৯৭৯

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষের দাম্পত্যজীবনের এমন একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যার উপর আমল করলে এখনই আমাদের সংসার 'জান্নাত-নযীর' হয়ে যেতে পারে।

দু'জন নারী-পুরুষ যখন একত্রে ঘর-সংসার করবে তখন একজনের সবকিছু অপরজনের ভালো লাগবে এটা হতেই পারে না। কিছু আচরণ ভালো লাগবে, কিছু মন্দ

লাগবে, এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে পুরুষের করণীয় হলো, স্ত্রীর ভালো গুণগুলোর দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহর শোকর আদায় করা। আল্লাহর শোকর আদায় করবে, আবার আন্তরিকভাবে স্ত্রীর প্রশংসা করবে। তখন হয়ত আল্লাহ তার মন্দ স্বভাবগুলো দূর করে দেবেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

و عاشروهن بالمعروف, فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيأ و يجعل الله فيه خيرا كثيرا

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই যে তার স্ত্রীদের জন্য তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের জন্য সর্বোত্তম। সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ. ১৪২; জামে তিরমিযী, হাদীস : ১১৬২

এই হাদীস দ্বারা একজন আদর্শ স্বামীর চরিত্রের সনদদাতা হিসেবে স্ত্রীকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

কন্যা ও ভগ্নি হিসেবে-

কন্যা ও ভগ্নি হিসাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ শুনুন, যার খোলাশা হলো, কারো ঘরে যদি তিনজন বা দুজন কন্যা বা ভগ্নি থাকে, আর সে তাদের উত্তম শিক্ষাদীক্ষা দান করে, তারপর তাদেরকে উত্তম পাত্রে বিবাহ দেয় তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম) কোন কোন বর্ণনায় আছে, তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। কোন বর্ণনায় আছে, তাহলে সে আর আমি জান্নাতে এরূপ পাশাপাশি থাকবো। তারপর তিনি দুই আঙ্গুল পাশাপাশি রেখে ইশারা করলেন।

হাদীসে এসেছে-

لا تكرهوا البنات, فإنهن المؤنسات الغاليات

অর্থঃ তোমরা মেয়েদের অপছন্দ করো না। কারণ তারা অন্তরঙ্গতা পোষণকারী মূল্যবান সম্পদ। মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৭৩০৬

যে কোন পরিবারে পিতা-মাতার প্রতি কন্যাসন্তানের অনুভব-অনুভূতি এবং সেই তুলনায় পুত্রসন্তানের অনুভব-অনুভূতি পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন কন্যসন্তানদের সম্পর্কে কেন একথা বলেছেন।

নারীদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুভূতিঃ

নারীসমাজের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুভূতি কেমন ছিলো এবং তাদের কষ্ট ও সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তিনি কত সজাগ ছিলেন এবং তাদের বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি তাঁর কিরূপ আস্থা ছিলো তা নীচের বর্ণনাগুলো থেকে পরিষ্কাররূপে বোঝা যাবে। তিনি ইরশাদ করেছেন-

حبب إلي من دنياكم الطيب و النساء و جعلت قرة عيني في الصلوة

অর্থঃ তোমাদের দুনিয়াতে সুগন্ধি ও নারীকে আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে, আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে ছালাতের মধ্যে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১২২৩৩)

এই হাদীছটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। কারণ সুগন্ধি ও নারীর একত্র উল্লেখ দ্বারা বোঝা যায় যে, স্বভাব ও ফিতরত এবং সৃষ্টিগত দিক থেকে নারী সুগন্ধির মতই সিণগ্ধ ও পবিত্র। সুগন্ধি যেমন হৃদয়ে মস্তিষ্কে কোমল ও সিণগ্ধ অনুভূতি সৃষ্টি করে, নারীর সংস্পর্শও তেমনি কোমলতা, সিণগ্ধতা ও পবিত্রতার অনুভূতি সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত এখানে পছন্দ করার কথা বলা হয়নি, বরং পছন্দ করানোর কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ নবীর অন্তরে নারীর এই প্রিয়তা ও পছন্দনীয়তা নিছক মানবিক কোন আকর্ষণ নয়, বরং এটি সম্পূর্ণ ঐশী বিষয়। আল্লাহ তা‘আলার গায়বি ইশারা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ এটি যত না জৈবিক তার চেয়ে অনেক বেশী আত্মিক ও আধ্যাত্মিক। বলাবাহুল্য, এতে স্ত্রীজাতির আধ্যাত্মিক মর্যাদাও প্রকাশ পায়। অথচ ইসলামের পূর্বে নারীকে অপবিত্র সত্তা বলে সাব্যস্ত করেছে।

স্ত্রীজাতির সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তিনি কতটা সজাগ ছিলেন তা নীচের এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়। ঘটনার খোলাছা এই যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে নামায পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় পিছন থেকে কোন শিশুর কান্নার আওয়ায পেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি নামায সংক্ষিপ্ত করে সালাম ফেরালেন, আর বললেন, আমি নামায সংক্ষিপ্ত করেছি, যাতে ঐ মা তার সন্তানের কারণে পেরেশান না হয়। (সহীহ বুখারী, সালাত অধ্যায়)

একসফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, আনজাশা নামে এক সাহাবী উট দ্রুত হাঁকিয়ে নিচ্ছেন। ঐ উটের আরোহী ছিলো নারী। তখন তিনি সাহাবীকে ধীরগতিতে ও কোমলভাবে উটচালনা করার আদেশ দিয়ে বললেন-

رويدك يا أنجشة, رفقا بالقوارير

অর্থঃ ধীরে হে আনজাশা! কাচের পাত্রগুলোর প্রতি কোমল হও। (বুখারী ও মুসলিম) নারীকে কাচের পাত্রের সঙ্গে উপমা প্রদান করা কত যে প্রজ্ঞাপূর্ণ তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই একটি উপমা দ্বারাই উম্মতকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নারীর স্বভাব ও প্রকৃতি কত কোমল এবং তাদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে পুরুষকে কত সতর্ক, সাবধানী ও কোমল হতে হবে। (এটা অবশ্য আলাদা বিষয় যে, মুসলিম নারীদের প্রতি মুসলিম পুরুষদের বর্তমান আচরণ কিরূপ? বর্তমানে কতজন মুসলমান এমন আছেন, যারা নবীর এই মহামূল্যবান উপদেশের প্রতি যত্নবান? ঘরে ও সফরে নারিদের সুখ-সুবিধার প্রতি তারা কী পরিমাণ খেয়াল রাখে? কী পরিমাণ কোমল আচরণ করে? আর কাল কেয়ামতের দিন তাদের নবীর কাছে তারা কী জবাব দেবে?)

ইলমের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকারঃ

ইসলামের পূর্বে অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতা যেখানে নারীর শিক্ষার কোন অধিকারই স্বীকার করেনি। এমনকি আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায়ও এই সেদিন পর্যন্ত যেখানে নারীশিক্ষাকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো সেখানে ইসলাম সেই প্রথম দিন থেকে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষার সমান অধিকার ঘোষণা করেছে।

কারণ এটা তো বলাই বাহুল্য যে, দ্বীন ও শরীয়াতের উপর আমল করা পুরুষের জন্য যেমন ফরয তেমনি নারীর জন্যও ফরয। আর শরীয়তের ইলম অর্জন না করে শরীয়তের উপর আমল করা সম্ভব নয়।

رب زدنی علما

অর্থঃ হে আল্লাহ আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো। (সূরা ত্বহা : ১১৪)

আর কোরআনের এই প্রার্থনা তো পুরুষ ও নারী উভয়েই আল্লাহর কাছে করে থাকে। আর এটা শুধু জ্ঞান অর্জনের দু'আ নয়, বরং অধিক থেকে অধিক জ্ঞান অর্জনের দু'আ।

طلب العلم فريضة على كل مسلم

অর্থঃ ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ২২৪; তবরানী-আওসাত, হাদীস : ৯) এ হাদীছ ওলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া তলবে ইলমের যত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে তা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই।

فعلمها و أحسن تعليمها, و أدبها فأحسن تأديبها

অর্থঃ তাকে ইলম শিক্ষা দিলো এবং উত্তম শিক্ষা দিলো, আর তাকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিলো এবং উত্তম শিক্ষা দিলো। (সহীহ বুখারী)

এই হাদীছে স্বয়ং পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যেন তার তাদের অধীন নারীদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে, আর এর বিনময়রূপে জান্নাতের ঘোষণা এসেছে।

বর্ণিত আছে যে, জনৈকা স্ত্রীলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষেরা তো আপনার উপদেশ একাকভাবে নিয়ে গেলো। সুতরাং আমাদের জন্য আপনার একটি দিন নির্ধারণ করে দিন যখন শুধু আমরা আপনার কাছে আসবো। আপনি আমাদের ঐ ইলম থেকে শিক্ষা দান করবেন যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দান করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আবেদন গ্রহণ করে বললেন, তোমরা অমুক অমুক দিন একত্র হও। (সহীহ বুখারী, ইলম অধ্যায়)

এ হাদীছ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে যে, ইলম অর্জনের জন্য নবীর কাছে যেমন নারীদের আলাদা সময় পাওয়ার হক ছিলো তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত ওয়ারিছীনে নবীর কাছেও সেটা পাওয়া তাদের হক।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাহতুল মিমিনীনের লেখা শেখার ব্যবস্থা করেছিলেন বলেও সীরাতের কিতাবে প্রমাণ রয়েছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফছা (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্য স্ত্রীসাহাবী লিখতে জানতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) ইলম ও ফিকহের ক্ষেত্রে এবং সমকালীন শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তা বোঝা যায় নিমেণাক্ত বর্ণনা থেকে।

হযরত ওরওয়া বিন যোবায়র তাঁর খালা সম্পর্কে বলেন, ফারায়েযের ইলম, হালাল-হারামের মাসায়েল এবং কোরআনের ইলমের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা.)-এর চেয়ে বড় আলিম আমি দেখিনি। প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত মসরূক বলেন, আল্লাহর কসম, বড় বড় ছাহাবাকে আমি তাঁর কাছে মীরাছের মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি।

হযরত ওরওয়া আরো বলেন,

সাহিত্য, কবিতা, চিকিৎসা এবং আরবজাতির ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী আমি দেখিনি।

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রেও তার মর্যাদা ছিলো অনেক পুরুষ সাহাবীরও উপরে। জ্ঞানচর্চা ও তলবে ইলমের ক্ষেত্রে আরো বহু স্ত্রী সাহাবীর নাম এখানে উল্লেখ করা যায়।

যেসকল স্ত্রী সাহাবী কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, হযরত খানসা, সু'দা বিনতে কোরায়য (হযরত উছমান রা.-এর খালা), নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধবোন শায়মা, আতেকা বিনতে যায়দ ও অন্যান্য। বর্ণিত আছে যে, হযরত খানসা (রা.)-এর কবিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করতেন, আর হাতে ইশারা করে বলতেন, হে খানসা, আরো কিছু শোনাও। (ইলইসাবা, ইবনে হাজার ৪/২৪৮৬-২৪৮৭)

নারীসমাজের ইলমচর্চার এ ধারা পরবর্তী যুগেও অব্যাহত ছিলো।

কারীমাহ আলমারওয়াযিয়্যাহ ছিলেন অনেক উচ্চস্তরের মুহাদ্দিছাহ। বহু মুহাদ্দিছ পর্দার আড়াল থেকে তাঁর কাছ থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। ইবনে আসাকির বলেন, ইমাম বুখারী যেসকল নারী মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ তাঁর নারীশায়খ-এর সংখ্যা ছিলো আশির উপরে। ইমাম যাহাবী রহ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে যেখানে বহু পুরুষ বর্ণনাকারী মিথ্যাচারী বলে অভিযুক্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন দোষ-দুর্বলতার কারণে পরিত্যক্ত বলে সাব্যস্ত হয়েছেন সেখানে কোন নারীবর্ণনাকারী অভিযুক্ত বা পরিত্যক্ত সব্যস্ত হননি।

হানাফী ফিকহ-এর সুপসিদ্ধ কিতাব 'বাদায়েউস সানায়ে'-এর রচয়িতা আল্লামা কাসানী রহ, এর স্ত্রী হলেন ফাতেমা। তিনি এত উচ্চস্তরের ফকীহা ছিলেন যে, তিনি, তাঁর পিতা আল্লামা সমরকন্দী ও স্বামী আল্লামা কাসানী, এই তিনজনের
সম্মিলিত স্বাক্ষরে ফতোয়া জারি করা হতো।

এমনকি হিন্দুস্তানের ইতিহাসেও এর নমুনা রয়েছে। ভুপালের প্রসিদ্ধ আলিম মুফতি মাওলানা আব্দুল কাইউম (রহ.)-এর স্ত্রী ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লহ দেহলবী (রহ.)-এর খান্দানের নারী। তিনি এত বড় আলিমা ছিলেন যে, কোন কঠিন মাসআলার সম্মুখীন হলে মুফতী আব্দুল কাইউম (রহ.) বলতেন অপেক্ষা করো, আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে বলছি।

সালাফ ও খালাফের এই ধারাকে পুনর্জীবিত করা এখন সময়ের দাবি।

ওলামায়ে কেরামের নিকট নিবেদন, তারা যেন নারীদের শিক্ষা ও তারবিয়তের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন এবং উপযুক্ত ও আদর্শ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

জীবিকার দায় থেকে অব্যাহতিঃ

জীবনের সবচে' কঠিন কাজ জীবিকার জন্য ঘাম ঝরানো এবং উপার্জনের জন্য দৌড়ঝাঁপ করা। ইসলাম নারীসমাজের প্রতি অনেক বড় একটি ইহসান এই করেছে যে, তার নিজের এবং পরিবারের অন্যসবার জীবিকা থেকে এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দান করেছে এবং তা পুরুষের কাঁধে অর্পণ করেছে। এটা কন্যা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে এবং সন্তানের মা হিসাবে বাবার কাছে, স্বামীর কাছে এবং সন্তানের পিতার কাছে নারীর অধিকার ও প্রাপ্য।

মানবসমাজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য এবং সবচে' বড় কথা, আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত খেলাফতের দায়িত্ব বহন করার জন্য সবচে' গুরুত্বপূর্ণ, সবচে' কঠিন ও কষ্টকর যে দায়িত্ব তা হলো সন্তান ধারণ ও সন্তান প্রসব। কে পালন করবে এ মহা-দায়িত্ব? আমাদের আল্লাহ এজন্য পুরুষের পরিবর্তে নারীকে নির্বাচন করেছেন এবং নারীর দেহসত্তা ও মানসসত্তাকে সেভাবেই তৈরী করেছেন।

তারপর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানের শারীরিক ও মানসিক প্রতিপালন, তার শিক্ষা, দীক্ষা, নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন। দুনিয়ার মানুষ গর্ব করে বলে, আজকের শিশু আগামী দিনের আদর্শ নাগরিক। আমরা বলি, আজকের শিশু হলো আগামী দিনের আদর্শ মা, আদর্শ বাবা এবং আলিমে দ্বীন, দাঈ ইলাল্লাহ ও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। তো কে পালন করবে শিশুকে গড়ে তোলার এ মহাদায়িত্ব? এখানেও নারীর ভূমিকাই বড়। এজন্যই ইসলাম নারীকে জীবিকার দৌড়ঝাঁপ থেকে এবং সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যেন সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব স্বস্তির সঙ্গে, নিরাপত্তার সঙ্গে এবং মর্যাদার সঙ্গে পালন করে যেতে পারে। পুরুষের কর্তব্য নারীর এই ত্যাগ ও কোরবানিকে কৃতজ্ঞচিত্তে মূল্যায়ন করা এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নারীর অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব কৃতার্থতার সঙ্গে পালন করে যাওয়া।

কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থতার সঙ্গে কেন? উত্তরে বলা যায়, মাতৃত্ব দিয়ে নারীকে আল্লাহ গৌরবান্বিত করেছেন, আর পিতৃত্ব দিয়ে পুরুষকে আল্লাহ মুক্তি দান করেছেন। মাতৃত্বের গৌরব অর্জন করার জন্য পৃথিবীর প্রতিটি নারীকে প্রতিবার জীবন-মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হয় এবং দীর্ঘ নয়মাস ব্যথার সাগর পাড়ি দিতে হয়। পক্ষান্তরে পুরুষকে শুধু উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও ব্যয়ভার বহন করতে হয়।

আল্লাহ তো নারী ও পুরুষ উভয়ের স্রষ্টা। তিনি জানেন, মাতৃত্ব কীভাবে অর্জিত হয়, আর পিতৃত্ব লাভ হয় কার কষ্টের সুফলরূপে। আল্লাহ বলেছেন-

ووصينا الانسان بوالديه احسانا حمتله امه كرها ووضعته كرها

অর্থঃ আর মানুষকে আমি উপদেশ দিয়েছি তার মা-বাবার সঙ্গে সদাচার করার। তার মা তাকে বহন করেছে কষ্ট করে এবং প্রসব করেছে কষ্ট করে।

আল্লাহ তাআলা পিতামাতা উভয়ের প্রতি সদাচারের আদেশ করার পর বিশেষভাবে মার কষ্টের কথা বলেছেন। এভাবে আল্লাহ নারীর মাতৃত্বকে মহিমান্বিত করেছেন এবং সম্ভবত এ বিষয়েও তাম্বীহ করেছেন যে, পুরুষের পিতৃত্বের পিছনেও নারীর গর্ভযন্ত্রণা ও প্রসববেদনার অবদান।

তো পুরুষ তার এমন জীবনসঙ্গিনীর জন্য একটু ছাদের ছায়া, একটুকরো রুটির অন্ন এবং একখন্ড বস্ত্রের আবরণ যোগাড় করবে না? করতে হবে এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই করতে হবে। পুরুষের এটা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, আইনগত দায়িত্ব। ইসলামী খিলাফত কায়েম হলে রাষ্ট্রশক্তি পুরুষের এই দায়িত্বপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করবে, করতে বাধ্য। এ জন্য নারীকে কেন তার মূল দায়িত্ব ছেড়ে ঘর থেকে বের হতে হবে? কেন তাকে দুনিয়ার ঝামেলায় জড়াতে হবে?

অন্তত মুসলিম বিশ্বে যত সরকার আছে, পাশ্চাত্য ও জাতিসঙ্ঘের হাতে ‘নৃত্যপুতুল’ না হয়ে তারা সত্যি যদি নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে চায় তাহলে আইন করে এ বিষয়টি নিশ্চিত করুক।

সম্পদ সঞ্চয়ের অধিকারঃ

ইসলাম নারীসমাজের উপর দ্বিতীয় যে ইহসান করেছে তা এই যে, তাকে তার নিজস্ব পরিমন্ডলে সম্পদ উপার্জনের এবং সঞ্চয়ের অধিকার দান করেছে। মীরাছ ও মোহররূপে যে সম্পদ সে লাভ করবে, নিজের শ্রম দ্বারা যে সম্পদ সে উপার্জন করবে সেগুলোর উপর তার পূর্ণ অধিকার ইসলাম নিশ্চিত করেছে। নারী যতই সম্পদশালী হোক, তার ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের, নারীর নিজের নয়। হাঁ, সচ্ছল নারী যদি স্বামীকে হাদিয়া দেয়, ছাদাকা দেয়, দিতে পারে এবং সে জন্য সে দ্বিগুণ আজর পাবে। যেমন হাদীছ শরীফে এরকম মযমূন এসেছে-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী হযরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তার স্বামী ও কয়েকজন ইয়াতিমের জন্য

খরচ করতেন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে সদাকা করতে উৎসাহিত করলেন। তখন যায়নাব রা. স্বামীকে বললেন, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমার জন্য ও আমার তত্ত্বাবধানে থাকা ইয়াতীম শিশুদের জন্য যে খরচ করে থাকি তা ঐ সদাকার মধ্যে গণ্য হবে কি না। তিনি বললেন, আমার লজ্জা করে, তুমিই গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।

হযরত যায়নাব দরবারে নববীর দুয়ারে হাযির হলেন। দেখা গেলো, আরো কতিপয় নারী একই উদ্দেশ্যে সেখানে একত্র হয়েছে। এর পর তারা সকলে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উত্থাপন করলেন, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে পাঠালেন যে, তারা দ্বিগুণ ছাওয়াব পাবে, সাদাকা করার এবং আত্মীয়তা রক্ষা করার। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৪৬৬)

পাশ্চাত্যে নারীসমাজের দুর্দশাঃ

আধুনিক যুগে নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন মূলত শুরু হয়েছে পাশ্চাত্যে, ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরও শুরু হয়েছিলো পাশ্চাত্যসমাজে। নারী-স্বাধীনতা ও ধর্মের প্রতি বিদ্রোহ, এদু'টোর পিছনে অভিন্ন কারণ কাজ করেছে। প্রথমেই আসে ধর্ম ও সভ্যতার দ্বন্দ্বের বিষয়টি। ইসলামের সোনালী যুগে মুসলিমসমাজে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয় তখন বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। বরং ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচর্যায় এগিয়ে এসেছে। কারণ ইসলাম হলো বিজ্ঞানময় ধর্ম। তাই ইসলাম তার অনুসারীকে আলকোরআনের মাধ্যমে শুরু থেকেই আহবান জানিয়েছে যেন আল্লাহর পরিচয় লাভের জন্য সে সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা করে। ইসলামী জাহানে যখন বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ, পাশ্চাত্য তখন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো। অনেক পরে মুসলিমজাহানের অনুসরণে পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। তবে উভয় সভ্যতার মধ্যে একটি বুনিয়াদি পার্থক্য ছিলো। ইসলামে জ্ঞানসাধনা ও বিজ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য ছিলো সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহ ও স্রষ্টার পরিচয় লাভ করা, যা অতি বড় ইবাদত; পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চার মূলে ছিলো প্রকৃতির গোপনশক্তিকে আয়ত্ত করে সম্পদ আহরণ করা।

মানবজাতির দুর্ভাগ্য এই যে, ইউরোপে গীর্জার ধর্মনেতারা বিজ্ঞানচর্চার বিরুদ্ধে চরম হিংস্রতার সঙ্গে রুখে দাড়িয়েছিলেন। সে ইতিহাস বড় মর্মন্তুদ, যার বিবরণ তুলে ধরার এখানে অবকাশ নেই। গীর্জার অসহায় ধর্মনেতাদের অবশ্য এছাড়া উপায়ও ছিলো না। কারণ বিজ্ঞান খৃষ্টধর্মের বিশ্বাসের বুনিয়াদ ধরেই নাড়া দিয়েছিলো। ফলে শুরু হয়ে যায় বিজ্ঞান ও খৃষ্টধর্মের সঙ্ঘাত। তাতে স্বাভাবিকভাবেই খৃষ্টধর্মের পরাজয় ঘটে।

যদি বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর পাশ্চাত্যের খৃষ্টজগত ইসলাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতো তাহলে মানবসভ্যতার ইতিহাস আজ অন্যরকম হতো, কিন্তু তা হয়নি। বিজ্ঞান পাশ্চাত্যকে নিয়ে গেছে নাস্তিক্যবাদ ও চরম ভোগবাদের দিকে।

একই ভাবে ইসলাম যেখানে আবির্ভাবলগ্নেই চরম লাঞ্ছনা ও দুর্গতির শিকার নারীজাতিকে তার প্রাপ্য মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে সেখানে পাশ্চাত্যে এই কিছুদিন আগেও নারী তার মৌলিক মানবিক অধিকার থেকেই ছিলো বঞ্চিত, যার সংক্ষিপ্ত চিত্র পিছনে আমরা তুলে ধরেছি। পাশ্চাত্যে ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা সবকিছু ছিলো নারী-নির্যাতনের হাতিয়ার। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই প্রতিটি ক্রিয়ার সমান একটি প্রতিক্রিয়া থাকে। সেই অনিবার্য প্রতিক্রিয়ারূপে সেখানে নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয় এবং শুরু হয় অবধারিত সংঘর্ষ। একদিকে ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা যেমন নারী-অধিকার আন্দোলনে সোচ্চার স্বাধীনচেতা নারীদের উপর চরম হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, অন্যদিকে নারীসমাজও সকল নিয়ম-কানুন ও বিধি-বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন করে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। ইউরোপে নারীসমাজ যে অমানবিক নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার ছিলো তাতে তাদের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ ছিলো স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক। কিন্তু তাদেরকে আলোর সিঁড়ি এবং মুক্তির রাজপথ দেখিয়ে দেয়ার কেউ ছিলো না। একথা বলারও কেউ ছিলো না যে, 'যে অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য ধর্ম, সভ্যতা ও সমাজের বিরুদ্ধে তোমাদের বিদ্রোহ, তা ইসলাম ও মুসলিম-সভ্যতা শুরু থেকেই তোমাদেরকে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে দিয়ে রেখেছে।'

এসব কথা তাদের বলার কেউ ছিলো না, বরং লালসাগ্রস্ত সুচতুর একদল পুরুষ তাদের সামনে তুলে ধরে সমঅধিকার ও অবাধ স্বাধীনতার অলীক স্বপ্ন। কারণ তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিলো গৃহের নিরাপদ বেষ্টনীর বাইরে এনে নারীকে ভোগের পাত্রী ও লালসার শিকার করা। স্বাভাবিক কারণেই পুরুষের সে হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে।

তো পাশ্চাত্যের নারী-আন্দোলনের ফল কী দাঁড়িয়েছে? নারী তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব থেকে কোনভাবেই অব্যাহতি পায়নি এবং পাওয়া সম্ভবও নয়। তদুপরি

নিজের ভরণপোষণের দায় এবং পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্বও চেপেছে তার উপর। জীবন ও জীবিকার কঠিন রণাঙ্গনে নারীকেও নামতে হয়েছে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। 'একঠোঙ্গা' মিষ্টি যত সহজলভ্য, পুরুষের কাছে নারী হয়ে উঠলো তার চেয়েও সহজলভ্য। অথচ শত লাঞ্ছনার পরও নারী ছিলো পুরুষের কাছে দুর্লভ সম্পদ। স্বাধীনতার নামে কিছু সুযোগ, কিছু সুবিধা পাশ্চাত্য-নারীর সামনে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে, যা আগে সে কোনভাবেই ভোগ করতে পারেনি, কিন্তু বিনিময়ে তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে তার নারিত্ব, সতিত্ব, মাতৃত্ব, সম্মান, গৌরব ও মর্যাদা। ঘরে হয়ত তাকে একজন পুরুষের সেবা ও মনোরঞ্জন করতে হতো, এখন বাইরে তাকে হতে হয় বহুপুরুষের লালসার শিকার।

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা তকী উছমানী, আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন, বড় সুন্দর লিখেছেন, 'আশ্চর্য তামাশার বিষয় এই যে, নারী যখন ঘরে বসে স্বামী-সন্তানের সেবা করে, খাবার রান্না করে, ঘরদোর সাজায় তখন সেটা হয় পশ্চাদপদতা ও মৌলবাদিতা, পক্ষান্তরে এই নারী যখন বিমানবালা হয়ে চারশ পুরুষের জন্য ট্রে সাজিয়ে খাবার সরবরাহ করে, আর তাদের লালসা-দৃষ্টির শিকার হয় তখন সেটা হয় সম্মান ও মর্যাদা!' (ইছলাহী মাওয়াইয, পৃ. ১৫৪)

এখানে আমি মুসলিম নারী-সমাজের পক্ষ হতে যথাযোগ্য বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করতে চাই যে, প্রত্যেক জাহিলিয়্যাতের মতো পশ্চিমা জাহিলিয়্যাত ও নারীর প্রতি পশ্চিমা প্রতারণামূলক শোষণ থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় নিঃসন্দেহে ইসলামেই আছে। তবে তা যদি শুধু বইয়ের পাতায় কিংবা মৌখিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে এই শিক্ষার কোনো ফায়েদা চোখে পড়বে না। এর জন্য অপরিহার্য হল, খায়রুল কুরূনের পরিবারগুলোর মতো আমাদের সকল পরিবার নারীর জন্য ঐ ইসলামী শিক্ষার বাস্তব নমুনা হওয়া। আমাদের প্রত্যেক আলিম ও মুবাল্লিগের ঘর যেন অন্যদের জন্য উত্তম আদর্শ হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন দাওয়াত ও ইলমে দ্বীনের ব্যাপক চর্চা এবং মুবাল্লিগ ও মুআল্লিমদের পরিবারে এর যথাযথ বাস্তবায়ন। এই দায়িত্ব পালনের এখন আর কোনো বিকল্প নেই।

আমি আমার সমাজের পক্ষ হতে আবারও বলবো, আল্লাহর নামে, ইসলামের নামে আমাদের কোন শেকায়াত নেই। আল্লাহর কাছে, ইসলামের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। আমাদের পেয়ারা নবী আমাদের অনেক দিয়েছেন, আমাদের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত দিয়েছেন; সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু আজকের মুসলিম সমাজ!

আল্লাহর ওয়াস্তে ঘরে আমাদের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু নিশ্চিত করুন। আমাদের ত্যাগ ও আত্মত্যাগের মূল্যায়ন করুন। বুঝতে চেষ্টা করুন, নারীও মানুষ; তারও ইচ্ছা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, চাহিদা ও প্রয়োজন আছে। বিশ্বাস করুন, আমাদের ঘরগুলোতে যদি ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা তাদের প্রাপ্য অধিকারসমূহ পেতে থাকেন তখন পৃথিবীর সকল নারী এই সত্যকে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করবে এবং পশ্চিমা সভ্যতার আপাত সৌন্দর্য ও নারীবাদীদের কপট শ্লোগান তাদের প্রতারিত করতে পারবে না। তারা ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে নিজেই নিজের মান-মর্যাদা ও ইযযত-আব্রুর হেফাযত করবে।

পাশ্চাত্যে নারী-স্বাধীনতার বিষফলঃ

আমাদের দেশে নারী-স্বাধীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে এবং স্বার্থবাদী পুরুষদের সুচতুর প্রচারণা ও প্ররোচনায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারীসমাজের একটা অংশ তাতে যথেষ্ট বিভ্রান্তও হয়েছে, আমার মনে হয়, এর পিছনে দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত কোরআন-সুন্নায় মুসলিম নারীর যে আদর্শ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং ইসলাম নারীকে যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে, সোনালী যুগের মুসলিমসমাজে যার বাস্তব নমুনা বিদ্যমান ছিলো, এখনকার মুসলিম সমাজে তা বিদ্যমান নেই। সুতরাং আগেও বলেছি, আবারও বলছি, আমাদের প্রথম কাজ হবে, অন্তত নিজেদের সমাজে ইসলামের সোনালী অতীতের সেই নমুনা আবার ফিরিয়ে আনা, যা দেখে বৃহত্তর মুসলিম নারীসমাজ প্রতারণাকারীদের প্রতারণা বুঝতে পারবে, ইসলামের দেয়া নারী-অধিকারের প্রতি উদ্বুদ্ধ হবে।

দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্যের চোখ ধাঁধানো নারী-স্বাধীনতার মোহজালে তারা আটকা পড়ছে; অথচ এর ভিতরের কদর্যতা তাদের সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি। এখানে আমি সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই।

একথা সত্য, পাশ্চাত্যের নারী আজ কিছু স্বাধীনতা ভোগ করছে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তারা যোগ্যতা ও প্রতিভার প্রমাণও দিচ্ছে। তাদের জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যও এসেছে। কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলে যাই, পাশ্চাত্যে প্রতিটি নারী হিলারি ক্লিন্টন নয়। (অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাকেও ক্লিন্টনের নাম, যশঃ ও অপযশঃ সবই বয়ে বেড়াতে হয়।)

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা তকী উছমানী বড় শিক্ষণীয় কথা লিখেছেন, 'নারীরা এখন এ ধোকায় আছে যে, বাইরে বের হয়ে আমার মর্যাদা বেড়েছে। আসলে এ ধোকা দিয়েই তাকে বাইরে বের করে আনা হয়েছিলো। কিন্তু এখন সবকিছু বুঝেও আবার ঘরে ফিরে আসার ক্ষেত্রে সে দ্বিধা-দ্বন্দের শিকার।

তাকে এই ধোকা দেয়া হয়েছিলো যে, তোমরা বাইরে বের হও এবং পুরুষ যত মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করছে তোমরাও তা অর্জন কর। তোমরাও রাষ্ট্রপ্রধান হও। তোমরাও বড় বড় কাজ করো যেমন পুরুষ করছে। কিন্তু পরিসংখ্যান দেখুন, বাইরে বের হয়ে আসা কোটি কোটি নারীর মধ্যে ক'জন রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছে। হাতের আঙুলে তাদের গোনা যাবে, আর কোটি কোটি নারীকে রাস্তায় এনে বে-আব্রু করা হয়েছে। (ইছলাহী মাওয়াইয, পৃ. ১৫৩)

পাশ্চাত্যে কর্মজীবী নারীদের শতকরা ক'জন সরকারী-বেসরকারী উচ্চ পদে চাকুরী করে? এবং সেজন্য তাদেরকে কী পরিমাণ মূল্য দিতে হয়? পনেরো দিনও হয়নি, আই, এম, এফ (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল)-এর ব্যবস্থাপনা প্রধান হোটেল পরিচারিকার উপর যৌননির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। এর আগে তিনি তার সহকর্মী একনারী অর্থনীতিবিদের উপরও যৌন হামলা চালিয়েছিলেন তবে ক্ষমা চেয়ে পার পেয়েছিলেন। এখন তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন নারীর পক্ষ হতে অসংখ্য অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। বলাবাহুল্য, এরা সবাই উচ্চসমাজের নারী। পক্ষান্তরে সিংহভাগ নারীকেই করতে হয় সামান্য বেতনের নিমণস্তরের অসম্মানজনক কাজ, আর তাদের মন ও দেহ ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে প্রতিদিন। 'তাদের কাঁদবারও সুযোগ নেই' একথা বলেছেন আমেরিকার সি, এন, এন, এর একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা। তিনি নিমণস্তরের কর্মজীবী নারীদের সাক্ষাৎকার প্রচার করেছিলেন।

ড. মুস্তফা সিবাঈ বলেন, 'পাশ্চাত্য-নারীর স্বাধীন ও জৌলুসপূর্ণ জীবনের যে চিত্র আমাদের দেখানো হয়, বাস্তবে তা খুব কম নারীর ভাগ্যেই জোটে। কোটি কোটি সাধারণ নারীর জীবন সেখানে দাসীর চেয়েও জঘন্য। এমনকি বাইরের জৌলুসি জীবনের ভিতরেও আছে এমন আগুন-যন্ত্রণা যা অতীতে কোন জাতির নারী কোন সভ্যতার অধীনে ভোগ করেনি।

আমাদের দেশেও একই চিত্র আপনি দেখতে পাবেন। হাতে গোনা কিছু নারী কর্পোরেট চাকুরি করছে এবং ভোগবিলাসের জীবন যাপন করছে। অন্যরা হয় সাধারণ

কর্মক্ষেত্রগুলোতে নিগৃহীত হয়, আর না হয় পথে মাথায় ইটের বোঝা বয়। এর নাম যদি হয় অধিকার ও স্বাধীনতা, তাহলে দূর থেকে তাকে ‘প্রণাম’!

পারিবারিক ব্যবস্থায় ধ্বসঃ

পৃথিবীর সকল প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা এবং সকল ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা এ বিষয়ে একমত যে, মানবসমাজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে কোন মূল্যে পারিবারিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা অপরিহার্য। সেই সঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক সকল সমাজবিজ্ঞানী এটাও স্বীকার করেন যে, নারীই হলো পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। পরিবারব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার অর্থই হলো সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া, আর সমাজব্যবস্থা যখন ভেঙ্গে পড়ে তখন সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে, আধুনিক সভ্যতার ক্ষেত্রেও তা হতে বাধ্য।

নারীর বাইরে আসা এবং কর্মজীবী হওয়ার কারণে ইউরোপ আমেরিকায় আজ পারিবারিক ব্যবস্থা চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। একে তো পাশ্চাত্যের পুরুষ বিবাহবিমুখ হয়ে পড়েছে। তদুপরি কোন দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হচ্ছে না। একজন সমাজবিজ্ঞানী দুঃখ করে বলেছেন, ‘এমন স্বামী বা স্ত্রী এখন আপনি কমই দেখতে পাবেন, যে বলবে, এটা তার তৃতীয় বা চতুর্থ বিবাহ নয়। খুব কম সন্তানই এখন আপন মা, কিংবা আপন বাবাকে কাছে পায়। কুমারি মাতার সংখ্যা দিন দিন শুধু বেড়েই চলেছে না, বরং আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে।’

এর প্রধান কারণ হলো, স্ত্রী অর্থ উপার্জন করে সংসারে অর্থের যোগান দিচ্ছে, কিন্তু স্বামীকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছে না। ফলে পুরুষ ঘরের বাইরের জীবনের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে নারীও শেষ পর্যন্ত একই পথে পা বাড়ায়। ফলে পারস্পরিক অবিশ্বাস এমন চরম আকার ধারণ করে যে, বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। এ ক্ষেত্রে তাদের অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা হয় সবচে’ ক্ষতিগ্রস্ত। তারা ব্যাপকহারে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন সহিংস অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, যার প্রধান কারণ পারিবারিক তত্ত্বাবধানের অনুপস্থিতি। পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে খোদ পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তারা সমাজ ও সভ্যতার পতন ঘনিয়ে আসছে বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে শুরু করেছেন। তারা প্রায় সবাই একমত যে, নারীর বহির্মুখী কর্মজীবনই পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার একমাত্র কারণ। পাশ্চাত্যের পূজনীয় দার্শনিক রাসেলও এ কথা বলেছেন।

প্রখ্যাত তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ জন সিমন বলেন, 'নারী হয়ত কিছু অর্থ উপার্জন করছে, কিন্তু এর ফলে পরিবার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।'

আগস্ট কাউন্ট তার 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা' গ্রন্থে বলেন, 'সঠিক অর্থে মানব-উন্নয়ন করতে হলে নারী-জীবন যথাসম্ভব পরিবারকেন্দ্রিক ও ঘরোয়া হতে হবে এবং বাইরের কাজ থেকে তাকে মুক্ত রাখতে হবে, যাতে সে তার প্রধান দায়িত্ব পালন করতে পারে।'

তিনি আরো বলেন, 'এজন্য স্ত্রীর খাদ্যের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক।'

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট গর্বাচোভ তার সুবিখ্যাত 'প্রেস্ত্রয়কা' গ্রন্থে বলেছেন, 'মেয়েদের আমরা বাইরের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে এসেছি। তাতে উৎপাদন হয়ত কিছু বেড়েছে, কিন্তু এত বড় বিপর্যয় নেমে এসেছে যা রোধ করার কোন উপায় নেই। আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন চিন্তা করে উপায় বের করতে হবে, কীভাবে নারীকে ঘরে আনা যায়।'

ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থাঃ

সবকিছু হারিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তানায়কগণ পরিবার সম্পর্কে আজ যা ভাবছেন, ইসলাম চৌদ্দশ বছর আগেই তা বলে দিয়েছে এবং এরই উপর গড়ে উঠেছে ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা। কোরআন বলেছে-হে নারীসমাজ, তোমরা তোমাদের ঘরে স্থির থাকো।

ইসলামী বিশ্বে এত অন্যায়-অনাচার, এত অবক্ষয়-অধপতন এবং 'দুশমনানে ইসলামের' এত ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের পরো এখন পর্যন্ত যে পারিবারিক ব্যবস্থা কিছু না কিছু টিকে আছে তার মূল কারণ কিন্তু এটাই যে, মুসলিম উম্মাহর সিংহভাগ নারী এখনো ঘরে আছে এবং পরিবার ও সন্তান-সন্ততির দেখভাল করছে, যদিও অধিকাংশেরই সে শিক্ষা নেই।

পৃথিবীতে কোন প্রতিষ্ঠান একজন পরিচালক ও ব্যবস্থাপক ছাড়া টিকে থাকতে পারে না, একই ভাবে টিকে থাকতে পারে না দু'জন পরিচালকের উপস্থিতিতে। সুতরাং পৃথিবীর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও সবচে' মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিবার যেন সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয় এবং উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়, পরিবারের জন্য পরিচালক দরকার এবং একজন পরিচালক দরকার। তো ইসলাম তাকেই পরিবার-পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে যার কাঁধে পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এটাই একমাত্র যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা। এর বাইরে যা কিছু করা হবে তা শুধু বিপর্যয়ই ডেকে আনবে।

পাশ্চাত্য কী চায়?

পাশ্চাত্যসভ্যতার কর্ণধারগণ আজ পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে, তাদের সমাজ ও সভ্যতার অবক্ষয়ের মূল কারণ কী এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় কী? কিন্তু অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে এবং পরিবার-ব্যবস্থা ভেঙ্গে গিয়ে সমাজ ও সভ্যতার দেহে পচন ধরা শুরু হয়ে গেছে। এখন আর ফিরে আসার কোন উপায় নেই। এ বিষয়ে মিসরের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, ড. মুস্তফা সিবা'ঈ নিজের বড় শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। তিনি বলেন, '১৯৫৬ সালে লন্ডনে জনৈক ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে আমার কথা হয়। তিনি আমার কাছে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমরা এর ভালোটুকু গ্রহণ এবং মন্দটুকু বর্জন করি।

তিনি বললেন, এটা সম্ভব নয়। কারণ সভ্যতার সত্তা অবিভাজ্য। যেমন, ইউরোপে শিল্পবিপ্লব পরিবার ভেঙ্গেছে, কারণ কাজের জন্য নারীকে বাইরে আসতে হয়েছে, যা অনিবার্য ছিলো, অথচ সেটাই পরিবার ভাঙ্গার কারণ ছিলো। (এখন কোনটা নেবেন, কোনটা বাদ দেবেন?)

আমি বললাম, আমার মতে শিল্প বিপ্লব আপনাদের পরিবার ভাঙ্গার কারণ ছিলো না, কারণ ছিলো নারীর গৃহত্যাগ, আর তা অনিবার্য ছিলো না; বরং আপনারাই নারীকে বের করেছেন, প্রথমত নিজেদের প্রবৃত্তির তাড়নায়, দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক স্বার্থপরতার কারণে। আপনারা চাননি কন্যা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে এবং মা হিসাবে নারীর আর্থিক দায়িত্বভার বহন করতে। ফলে তারা বাড়ির বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

তিনি জানতে চাইলেন, এরূপ সমস্যায় আপনারা কী করবেন?

আমি বললাম, ইসলামে নারীর জীবিকা হয় পিতার উপর, না হয় স্বামীর উপর, (কিংবা সন্তানের উপর।) কোন অবস্থাতেই তার নিজের উপর নয়।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, পাশ্চাত্য এতটা স্বার্থত্যাগে অক্ষম।

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে। পানির জাহাযে বেলজিয়াম যাওয়ার পথে এক ইতালীয় তরুণীর সঙ্গে কথা হয়। অক্সফোর্ডে অধ্যয়নরতা এই তরুণী আমার কাছে ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে জানতে চায়। আমি যখন বললাম, ইসলাম নারীকে উপার্জনের কষ্ট থেকে অব্যাহতি দিয়েছে, সে গৃহকর্ত্রীরূপে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে, তখন সে অকপটে বললো, মুসলিম নারীর প্রতি সত্যি আমার ঈর্ষা হয়। কত ভালো হতো আপনাদের দেশে যদি আমার জন্ম হতো! আমি বললাম, তুমি কি পারো তোমার

সমাজের নারীকে গৃহমুখী হওয়ার এবং পুরুষকে তার দায়িত্ব পালন করার আবেদন জানাতে?

এবারও সে অকপটে বললো, সময় পার হয়ে গেছে। নারী এখন বাইরের জীবনের স্বাধীনতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এখন ঘরোয়া জীবন তার জন্য কঠিন হবে, যদিও আমি বিশ্বাস করি, এতেই তার শান্তি নিহিত।’

মোটকথা পাশ্চাত্যের চিন্তানায়কগণ জানেন যে এটা এখন অসম্ভব, অন্যদিকে মুসলিম সভ্যতায় পারিবারিক ব্যবস্থা এখনো সম্পূর্ণ অটুট। সুতরাং দুই সভ্যতার সঙ্ঘাতে ইসলামী সভ্যতার বিজয় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, যদি না মুসলিম পারিবারিক ব্যবস্থাকেও গুঁড়িয়ে দেয়া যায়। এজন্যই পাশ্চত্যের চিন্তানায়কগণ তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার নামে তাদের সমাজদেহের পচনব্যাধি আমাদের সমাজেও ছড়িয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে।

উপসংহারঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’য়ালা আমাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন বাবা আদম (আঃ) এবং হাওয়া (হাঃ) এর মাধ্যমে। নারী এবং পুরুষের যথাযথ অধিকার দিয়ে তিনি আমাদের দুনিয়াতে সম্মানিত করেছেন। ইসলাম এমন একটি দ্বীন যেখানে আল্লাহ নারীদের জন্য রেখেছেন তাদের যথাযথ মর্যাদা। কিন্তু বর্তমানে সমাজ আমাদের নারীদের সেখান থেকে দূরে সরিয়ে শয়তানী এজেন্ডা বাস্তবায়নে নেমেছে। এবং আমাদের নারীরাও তাদের সাথে সমান তালে এগুচ্ছে। যা এই সমাজ এবং পরিবার ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তন নিয়ে আসবে। রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন আখেরী জমানায় দাজ্জালের সবচেয়ে বেশি অনুসারী হবে নারীরা। সেটা কেন হবে তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি এখন। তাই আমাদের সমাজ এবং পরিবার ব্যবস্থা ঠিক রাখতে হলে আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো জীবন ব্যবস্থাকে আকড়ে ধরতে হবে কেয়ামত পর্যন্ত। ইসলাম নারীদের যে মর্যাদা দিয়েছে তা নিয়ে আমাদের নারীদের চলতে হবে।

আল্লাহ বলেনঃ

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ
٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ

أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١ [النور: ٣٠، ٣١]

অর্থঃ (হে নবী আপনি) মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটিই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনা মুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপান অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০-৩১]